জন্ম-মৃত্যুর সিগনেচার

বই	**জন্ম-মৃত্যুর সিগনেচার**
লেখক	মুনা আল হাফিজ
ভাষা-বিন্যাস	কুতুব হিলালী
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

জন্ম-মৃত্যুর সিগনেচার

মুসা আল হাফিজ

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

জন্ম-মৃত্যুর সিগনেচার

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০২২

প্রকাশনায়
মুহাম্মদ পাবলিকেশন
ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৭-৮৫১৩৮০, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইনে অর্ডার করুন
ওয়েলরিচ বিডি.কম-এ
www.wellreachbd.com
ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৭-৮৫ ১৩ ৮০, ০১৬৫১-৩৪ ৫১ ৯১
অথবা rokomari.com & wafilife.com -এ

বইমেলা পরিবেশক
বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ২২০ US $ 15, UK £ 10

JONMO-MRETUR SIGNATURE
Writer : Musa Al Hafiz

Published by
Muhammad Publication
Islami Tower, UnderGround, Shop # 18
11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01317-851380, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-95707-1-4

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অর্পণ

ফরিদ আহমদ রেজা
মায়াবী আগুন

প্রকাশকের কথা

স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনা ও সতেজ অভিব্যক্তিতে টইটম্বুর একটি চিত্তের জাগর উদ্ভাসন 'জন্ম-মৃত্যুর সিগনেচার।' সত্য যেখানে ধ্রুব। ন্যায় যেখানে অম্বিষ্ট। প্রেম যেখানে প্রপূর্ণ। বিশ্বাস যেখানে প্রোথিত। প্রশ্নশীল আত্মার শান্ত শামিয়ানাটি যেখানে মুক্ত উদ্বেল ও অবারিত এবং ঐকান্তিক অভিজ্ঞানে উন্মোচিত।

এই গ্রন্থের উচ্চারিত প্রতিটি ধ্বনি আপনাকে নিয়ে যাবে পুনর্বার স্বয়ং আপনার কাছেই। যে আপনি সত্যি ঘুমিয়ে আছেন অথবা জেগে থেকেও আরো বিস্ময়কর আলস্যের সুষুপ্তিতে খেইহীন দিগ্‌সন্ধানী অথচ স্বপ্নশীল উন্তাল উন্মাতাল; তাই এই বই আপনার জন্য একটি অভাবিতপূর্ব জীয়নকাঠি। প্রিয় পাঠক, আপনি জ্বলে উঠবেন এবং আপনাকে জ্বলে উঠতেই হবে এর মর্মবাণীর সৌম্যস্পর্শে।

এ বই আপনার মর্মলোকের শেকড়ে পানি সিঞ্চন করে। যার সুফল পেতে থাকবে জীবনভাবনার প্রতিটি ডাল-পালা। ফলে এ বইকে কোনো এক বিষয়ের গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানে আমাদের বোধ ও বুদ্ধি এবং হৃদয় ও মনকে সে আলোকিত করার প্রদীপ জ্বালায়। কেননা, এ বইয়ের প্রতিটি পঙক্তি একেকটি উজ্জ্বল প্রদীপ।

মুসা আল হাফিজ। এ নামটির সঙ্গে আপনাদেরকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। আমাদের সাহিত্যাঙ্গনে আজ তিনি একটি নাম; একটি উজ্জ্বল আগামীর উৎকীর্ণ ইতিহাস। তার সহৃদয় ভালোবাসা পেয়ে মুহাম্মদ পাবলিকেশন তার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

আল্লাহ তার হায়াতে ও ইলমে বারাকা দান করুন। তার ছায়া আমাদের জন্য আরও দীর্ঘ করুন।

আল্লাহ আমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন। সকলের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আল্লাহ মহা পবিত্র, খুঁতহীন ও সর্ব ত্রুটিমুক্ত। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লিম।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান

০২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি.

ভূমিকা

দর্শনের লক্ষ্য সত্যানুসন্ধান করা। আর দার্শনিকের কাজ সত্য অনুসন্ধানে সমস্যা চিহ্নিত করা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে যৌক্তিক ভিত্তি প্রদান করা। মানুষ যে সকল বৈশিষ্ট্যে মানুষ, এর মধ্যে সত্যব্রত ও সত্যস্পৃহা অন্যতম। এমন মানুষ কে—যে কমবেশি সত্যকে জানতে চায় না? ফলে দার্শনিক জিজ্ঞাসা প্রতিটি মানুষের স্বভাবজাত। মানুষ সন্তাগতভাবে চিন্তাশীল। মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই চিৎকার করে কান্না করে। কারণ, তার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা একেবারেই নতুন ও বৈচিত্র্যময়। আস্তে আস্তে সে যখন বড় হতে থাকে, বাড়তে থাকে তার কৌতূহল। অর্থাৎ কৌতূহল তার জন্মগত স্বভাব। এরপর সে কখনো বিস্ময়, কখনোবা সংশয় ভরে জানতে চায় তার জীবন ও জগতকে। আর মানুষের এ কৌতূহল ও বিস্ময়ই জন্ম দেয় দর্শনের। জীবন-জগৎ এবং সমস্যা নিয়ে সব মানুষই চিন্তাভাবনা করে। জীবনের সাথে দর্শনের যোগ তাই আকস্মিক কিছু নয়, অলৌকিক কিছু নয়। বরং দর্শন হলো অনিবার্য (Inevitable) ও স্বাভাবিক (Normal)।

দর্শনের প্রকাশের আছে নানা রকমফের, নানা চরিত্র। কিন্তু যে চরিত্রেই আত্মপ্রকাশ করুক, দর্শনে থাকবে যুক্তির কষ্টি পাথরে যাচাইকৃত ও পরীক্ষিত মতবাদ। এতে আমরা জীবনের নানা মৌলিক প্রশ্ন এবং সত্য ও তত্ত্বজিজ্ঞাসার মোকাবেলা করি। কিন্তু জীবনের মৌলিক প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করাই কেবল দর্শন নয়। জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনসহ আরো অনেক প্রয়োজন থেকেও দার্শনিক আলোচনার উৎপত্তি ঘটে। প্রয়োগবাদী দার্শনিক মতবাদ ব্যবহারিক প্রয়োগকে প্রাধান্য দিয়েই যাত্রা শুরু করে। উইলিয়াম জেমস, জন ডিউই, এফসি শিলার প্রমুখ এ দর্শনের প্রধান প্রবক্তা। জন ডিউই তার শিক্ষাতত্ত্বে উল্লেখ করেন, যে শিক্ষা মানুষের কাজে লাগে না, তা প্রকৃত শিক্ষা নয়। হাতে-কলমে শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষাকে

তারা বেশি গুরুত্ব দেন। বিখ্যাত দার্শনিক কানিং হামও তাই মনে করেন। মানুষের প্রয়োজনই মানুষকে জগৎ সম্বন্ধে তাকে চিন্তা করতে বাধ্য করে। একইভাবে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে গড়ে উঠে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক মতবাদ। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জ্যাঁ পল সার্ত্র, কিয়াকেগার্ড প্রমুখ মনে করেন, মানুষ এ সমস্যাবহুল পৃথিবীতে অসহায় অবস্থায় জন্ম নেয় এবং বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। হাজারো পরিস্থিতির মধ্যে তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় একান্ত নিজের জন্য। সেক্ষেত্রে তাকে তার নিজস্ব প্রয়োজন ও সমস্যার আলোকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তার কোনো প্রয়োজনকেই সে উপেক্ষা, অবহেলা বা অস্বীকার করতে পারে না।

এই যে সত্যতালাশ, তত্ত্বজিজ্ঞাসা এবং জীবনের মৌলিক প্রশ্ন ও প্রয়োজন, এর মধ্যে মুসা আল হাফিজের আবর্তন। কবিতায় গদ্যে তিনি মূলত উপলব্ধিতে এরই বয়ন করেন। চিন্তামূলক কথিকায় তত্ত্বভাষায় এরই বিশ্লেষণ করেন।

গভীর চিন্তাশক্তি, তীক্ষ্ণ অনুভূতি, বর্ণিল ও সৃজনশীল কল্পনাশক্তি আছে তাঁর। তার অনুভূতির ও কল্পনার সঙ্গে দর্শনের অনেক টুকরো টুকরো তত্ত্বকথা এবং ধর্মচিন্তার সঙ্গেও দর্শনের অনেক গভীরতর ভাবার্থ যে মিশে আছে—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তত্ত্বমূলক অনুকথনের ধারায় তার রচনাগুলো কাব্য ও গদ্যের প্রকরণ ভেঙে দেয়। এতে বহুমাত্রিক বিষয়চিন্তার মিথস্ক্রিয়া যেমন ঘটে, তেমনি প্রকাশকলার বহুরৈখিক সম্মিলন ঘটে। এতে তিনি ঠিক দার্শনিক বিষয় ধরে ধরে কাঠামোবদ্ধ আলোচনা করতে চান না। বরং একে ক্ষুদ্র বাক্যের পেয়ালায় পরিবেশন করেন। যার স্বাক্ষর তার নক্ষত্রচূর্ণ (২০১৯) বিষগোলাপের বন (২০২০) ও হৃদয়াস্ত্র (২০২১) গ্রন্থে আমরা ইতোপূর্বে লক্ষ্য করেছি। পূর্ববর্তী তিনটি গ্রন্থের ধারায় একই চারিত্র্যের নতুন গ্রন্থ আমাদের সামনে হাজির, যার নাম 'জন্মমৃত্যুর সিগনেচার'। এসব গ্রন্থে একই সাথে লজিক, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিসরে প্রতিফলিত। তা হয়েছে কখনো বাস্তববিবরণে, কখনো কল্পনায়। ব্যঙ্গ, পরিহাস, উপমা, নাটকীয়তা, বক্রোক্তি, সরাসরি বার্তাসহ নানা বিরল ধরনের সম্মিলন আছে এতে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতও বহুমুখী। ব্যক্তি-রাষ্ট্র, সুখ-অসুখ, ক্ষমতা-দুর্বলতা, শৃঙ্খলা-অরাজকতা, প্রেম-বিরহ, শাসন-দুঃশাসন, প্রকৃতি-প্রযুক্তি, নারী-পুরুষ, ধর্ম-অধর্ম, বিচার-অবিচার, সাম্য-

অসাম্য, নিষ্ঠা-ভণ্ডামি, যুদ্ধ-শান্তি, সংকট ও সম্ভাবনার মতো বিচিত্র প্রসঙ্গ পাঠকের সামনে আসতে থাকে।

এসব গ্রন্থের প্রতিটি বাক্যই কোনো না কোনোভাবে ফলদায়ক, কোনো না কোনো অন্তর্দৃষ্টির ঝলক বা নতুনত্বের সঞ্চারক। এতে লেখকের মননের উৎকর্ষের পরিচয় প্রতিফলিত। যখন তিনি কবিতা রচেন বা গল্পসম কিছু লেখেন বা যখন লেখেন কথিকা বা কথোপকথন বা নির্মাণ করেন ম্যাক্সিম বা এপিগ্রাম, দেখা যায় এই সব জঁনরাই এক অভিন্ন ঐশী আলোর উৎস থেকে উৎসারিত। সবগুলোতেই প্রকাশিত হয় একটি ভাববাদী ও যুক্তিশীল অবস্থান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তালোকের কেন্দ্র যেভাবে উপনিষদ, মুসা আল হাফিজের চিন্তালোকের কেন্দ্রও কুরআন-সুন্নাহ। বিশ্বসাহিত্যে এ থেকে চিন্তাজ্যোতি লাভের ধারা অনেক প্রশস্ত। এখান থেকে আলোক লাভ করে বিশ্বসাহিত্যে উচ্চাসনে সমাসীন হয়েছেন শেখ সাদি, জালালুদ্দিন রুমি, হাফিজ সিরাজী কিংবা নিকট অতীতের আল্লামা ইকবাল। মুসা আল হাফিজ শাস্ত্রকে বয়ান করেন না, তার বয়ানে গভীর দ্যোতনায় উঠে আসে এর নির্যাস। ফলে তা নিখাদ সাহিত্য হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়। ঐশী বিশ্বাসের সিলসিলায় যুক্তিবাদী-ভাববাদী দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টিকে তিনি কখনো কাব্য, কখনো সংলাপ-বিতর্ক, কখনো এফোরিজম, কখনো কথন আকারে প্রকাশ করেন। এতে একটি মননধারার মনের আওয়াজ মনের কান দিয়ে শোনা যায়।

দুই.

ম্যাক্সিম বা থট ফ্র্যাগমেন্ট রচনায় ব্লেইজ পাসকাল অনবদ্য মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছিলেন। জাঁক দেরিদা তাঁর Acts of religion গ্রন্থের Force of Law: The Mystical foundation of authority প্রবন্ধে কয়েক পাতা খরচ করেছেন ব্লেইজ পাসকালকে নিয়ে। Mystical Foundation of authority এই অভিব্যক্তিটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন মতেঁন, তারপর নিজের প্রয়োজনে এটি ব্যবহার করেছেন ব্লেইজ পাসকাল তার Pensées বইয়ে এবং তারপর এ নিয়ে গভীরতর আলাপ তুলেছেন দেরিদা। মুসা আল হাফিজের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন থট ফ্র্যাগমেন্ট এ পরম্পরার অংশ হয়েও অংশ নয়। অংশ; কারণ এ প্রকরণের আশ্রয় নিয়েছেন তিনি প্রায়শ। অংশ নয়; কারণ এ প্রকরণের মধ্যে নিজের প্রকাশকে সীমিত রাখেননি, কোনো ফর্মেই আটকে না থেকে মুক্তফর্ম ব্যবহার করেছেন এবং তার জীবনবোধ, জীবনভেদ ও জীবনবেদ গভীরভাবে ভিন্নতর।

তিন.

'জন্ম-মৃত্যুর সিগনেচার' গ্রন্থটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলো হচ্ছে—

(ক) প্রশ্নের শামিয়ানা

(খ) শীলিত শিলালিপি

(গ) গল্প কিংবা চৈতন্যদুহিতা

(ঘ) আগুনের মৌচাক

(ঙ) রুহানি শরাব

(চ) কথনের কোলাজ ও

(ছ) এক পেয়ালা কৈশোর।

প্রথম অধ্যায়টি প্রশ্নমূলক। তাকে ধারালো ও চোখা প্রশ্ন ও এর উত্তরের মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তেরটি শিরোনামে এসব বক্তব্য বিভক্ত। এতেও নানা বিষয়ের সমাহার ঘটেছে। বুদ্ধিবৃত্তি ও ঐশীধর্মের সম্পর্কের মতো জটিল বিষয়ও এখানে উপস্থাপিত। যা দীর্ঘ ও জটিল আলোচনার বিষয়। মুসা আল হাফিজ একে আপন মুন্সিয়ানায় অল্পকথায় উপস্থাপন করেন এক প্রশ্নের জবাবে। প্রশ্নটি হলো, আসমানি হিদায়েত থাকলে আর বুদ্ধিবৃত্তির কী দরকার? জবাবে তিনি বলেন, প্রাণী ও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিও আসমানি হিদায়েতের অংশ। ওহির কিতাব হচ্ছে বাইরের আসমানি হিদায়েত, ফিতরাত ও সহজাত বুদ্ধিবৃত্তি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ আসমানি হিদায়েত। মানুষের উদ্দেশ্যে প্রথমটি এসেছে দ্বিতীয়টিকে আলোকদানের জন্য, পথপ্রদর্শনের জন্য।

যাতে নিত্য নতুন জটিলতা ও সমস্যার উত্তরণে মানুষ দ্বিতীয় শক্তিকে প্রথমটির আলো দিয়ে পরিচালনা করতে পারে।

ফলে বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে না লাগালে আসমানি কিতাব নিশ্চল। আপনার মস্তিষ্ক শক্তি ও কর্মের দক্ষতা সরবরাহ করবে না। চমকপ্রদ প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে আমরা পেয়ে যাই জটিল ও দুর্গম নানা আলোকপাত।

চার.

দ্বিতীয় অধ্যায় শীলিত শিলালিপি মূলত ৬৩টি প্রজ্ঞাকথনের সমাহার। উক্তিগুলোর মর্মবাণী পরিশীলিত এবং তার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা শিলালিপির মতোই। উভয়দিকে ইশারা করে অধ্যায় শিরোনাম। এ অধ্যায়ে মুসা আল

হাফিজের কতগুলো প্রবচনমূলক ইশারাবাক্য ও প্রজ্ঞাকথন শুধু মুগ্ধ করে না, চিন্তাকে কাঁপিয়ে দেয়। সাথে কি জীবনদৃষ্টিতেও প্রভাব ফেলে না? ফেলে তো। এ রকম কিছু উক্তি হয়তো দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করলেও এগুলোর বিশ্লেষণের দায় রয়ে যায়। যা দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ রাখে। ফলে এর ব্যাখ্যা পাঠকের জাগ্রত উপলব্ধির হাতে তোলে রাখাই ভালো। কিছু নমুনা নিম্নরূপ। যেমন লড়াই সম্পর্কে তার উক্তি—

আপনি দুর্বল, তাই লড়াই করছেন না, বিষয়টি এমন নয়। কথা হলো, আপনি লড়াই করছেন না, তাই আপনি দুর্বল। (লড়াই ও আত্মশক্তি)

রাজনৈতিক নেতাদের মানসিকতা সম্পর্কে—

রাজনৈতিক টসে যে-সকল নেতা-নেত্রী জিতেন, তাদের জিজ্ঞেস করুন, বোলিং করতে চান না ব্যাটিং? তারা উভয়টিই করতে চাইবেন এবং বলবেন, এটিই নিয়ম। (রাজনৈতিক)

বিচিত্র ধরনের অত্যাচার সম্পর্কে—

আপনার সুরেলা সংগীতও ভীষণ অত্যাচার করতে পারে, যদি পাশে থাকেন কোনো মুমূর্ষু রোগী। (অত্যাচারের রকমফের)

কথা ও বাস্তবতা সম্পর্কে—

একশোবার মধুর গল্প শোনার চেয়ে একবার খাঁটি মধু পান করা বেশি ফলদায়ক। (ক্রিয়াশীলতা)

পাঁচ.

গল্প কিংবা চৈতন্যদুহিতা অধ্যায়টি এ গ্রন্থের এক শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। এখানে লেখকের চিন্তার সজীবতা ও গতিশীলতা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। গল্পের আশ্রয়ে এতে বলা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বহু কথা। যার মধ্যে আছে মাতৃউদরের শিশুদের সংলাপের মাধ্যমে বিশ্বাসের পক্ষে শক্তিশালী আর্গুমেন্ট, কবুতর ছানাদের মা হারানো ও মায়ের সন্ধানের বর্ণনার মাধ্যমে নিজেদের আসল পরিচয় অনুসন্ধানের বয়ান; এমন লোকের বর্ণনা, যে বুনো ঈগল পালতো, চোখের কাছে তার মুখ নিয়ে আদর করতো, একদিন ঈগল তার চোখ ছিনিয়ে নেয়, পরে উড়ে গিয়ে উপদেশ দেয় কাণ্ডজ্ঞানের। এরকম চমকপ্রদ বর্ণনাভাষ্য রয়েছে এগারোটি অণুগল্পে। গল্পগুলোকে চৈতন্যদুহিতা বা চেতনার মেয়ে আখ্যাদানের মধ্যে রয়েছে এর অন্তর্নিহিত গুরুত্বের ও আকারে তরুণ হবার ইঙ্গিত। এবং আমাদের চিন্তাযাপনের

দিনরাত্রির অজর কথকতা যেন এসব গল্প। এতে জীবনদৃষ্টির প্রাতিস্বিক বিভাস লক্ষণীয়। নানাভাবে নানা স্বরে তা প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষের জীবনচিন্তার ভুল ও শুদ্ধতার অন্তরীণ চিত্র উঠে এসেছে এসব অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ভাষ্যে।

ছয়.

আগুনের মৌচাক অধ্যায়ে চিন্তাপ্রধান কবিতার সমাহার ঘটেছে। কবিতা মূলত হয় কল্পনাপ্রধান। দর্শনের বিষয় বহুলাংশেই সূক্ষ্ম চিন্তা ও যুক্তির ওপর নির্ভর করতে হয়। দার্শনিকের দৃষ্টির সঙ্গে কবির দৃষ্টির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কবিরা কল্পনাপ্রবণ, আবেগপ্রবণ। যুক্তিতর্ক তাদের কাছে বড় নয়। কবির পথ অনুভূতির। আবেগ, কল্পনা ও অনুভূতিকে সত্য-উপলব্ধির যথার্থ মানদণ্ড বলেছেন মূলত কবিরাই, দার্শনিকরা তা বলেন না। ফলে কবিতা আর দর্শন খুব কমই একই স্রোতে প্রবাহিত হয়েছে। খুব কম কবিই কল্পনা ও আবেগের বদলে চিন্তাপ্রধান কবিতা রচনা করেছেন। সেখানে মুসা আল হাফিজ বিরল ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়েন।

এ অধ্যায়ের কবিতাগুলোতে চিন্তাকে কবিতা হয়ে উঠতে আমরা দেখি। যেভাবে দেখি এ কবির অন্যান্য কাব্যে। এখানে স্থান পাওয়া কবিতাগুলো হচ্ছে সেলফি, প্রিয়মুখ, এই বৃষ্টি, স্বরূপ, বাঘের আচরণ করতে চাইলে যা বলেছিলেন দেবদূত, হৃদয়ের দাম, হত্যাকাণ্ড, নদী ও জীবন, যা ঘটছে, দুই হাজার একুশে।

কবিতাগুলোতে আমরা লক্ষ করি দুটি অর্থ। একটি উপাখ্যানের, অন্যটি উপাখ্যানের অতীত ভাবের। প্রায় সব কবিতায় দেখি দুইটি জগৎ, একটিকে বাইরে দেখি, অন্যটি অন্তরের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়। আর এই অন্তরের ভাবটি হল গূঢ় তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও তত্ত্ব মীমাংসার অংশ। কিন্তু তাতে কাব্যিক মনোরমার ঘাটতি আসেনি তত্ত্বভারে। যেমন :

তোমাকে প্রশ্ন করবে সে—অতীতের আহত হে বন্ধুটি আমার!
কোথায় পেলে এমন হর্ম্যসৌধ অবাক প্রাসাদ
তুমি জবাবে হাসবে—বলবে, সেইসব পাথর, যা
থেকে তুমি পালিয়েছিলে... আমাকে মেরে
ফেলতে আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত সেই পাথরগুলোই
কুড়িয়ে কুড়িয়ে গড়েছি আমি সাধের এই প্রাসাদ

তারপর সেই বন্ধুটি দাঁড়াবে তোমার পাশে

প্রাসাদকে পেছনে রেখে—একটি সেলফি তোলার জন্যে। (সেলফি)

সম্ভাবনার সারা গায়ে

ভনভন করছে পোকা, মাছি, কীট ও পতঙ্গরাজি; যেন আস্ত বাংলাদেশ।

(প্রিয়মুখ)

বৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন বড় লঙ্কার ঝাল, বৃষ্টিকে বলেছেন বেঁচে থাকার সতীন। ছলনাময়ী রমণীর চোখের চেয়ে বৃষ্টিকে বলেছেন বেশি দুষ্পাঠ্য। এই বৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে মিথ্যা অঙ্গীকার। বুঝতেই পারছেন, বৃষ্টিকে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি জাতীয় জীবনের দুঃসহ রাজনীতি ও দুঃশাসনের চিত্রকে তুলে ধরেছেন। যা অস্বাভাবিকতা নিয়ে এসেছে। যেমনটির প্রতীক হচ্ছে বৃষ্টি। আরও স্পষ্ট করে তিনি বলছেন—

বৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে ঝড় ও স্বরের মন

আলোকে খেদিয়ে কুয়াশা এনেছে বলে

এই বৃষ্টিকে তারা বলছে মধুময় উন্নয়ন। (এই বৃষ্টি)

কিন্তু পরিস্থিতি এর চেয়েও জটিল। ভয়াবহ। সমাজ ও জীবনবাস্তবতার চিত্র করুণ। সবুজে, বাতাসে রচিত হচ্ছে কালের প্রহারের কথামালা। আর মানুষকে বানানো হচ্ছে ক্রমাগত দাস। নাকি মানুষ নিজেই দাসে পরিণত হচ্ছে আপন ভুলে? কবি বলছেন—

পানিতে ভাসতে থাকে ঈদের নামাজ

করোনারা ফেলে যায় বেওয়ারিশ লাশ

সাগরে নাচে ঢেউ; ভারী বদমেজাজ

সবুজে, বাতাসে লেখা কালের মারণ

ওদিকে—তোমরা হও আরও বেশি নির্জলা দাস। (এই বৃষ্টি)

বরাবরের মতোই বস্তুবাদী মন ও দৃষ্টিভঙ্গিকে এফোঁড়-ওফোঁড় করেছেন মুসা আল হাফিজ। অমোঘ ইতিবৃত্তের মতো তার কবিতা বলে যায় ঘটনা। এবং ঘটনা বলতে গিয়ে জানায় চলমান হৃদয়রিক্ত চিন্তা ও ভাবধারার কথা।—

তারা বিরক্ত হলো এবং

বললো, হৃদয় আসলে একটি মিথ্যা।

যদি সে সত্যও হয়; পুঁজি নেই, থাবা নেই, গ্ল্যামার নেই

অতএব, সে তাহা মিথ্যা বৈ কিছু নয়।

তাকে ছাড়াই আমরা শ্রেষ্ঠ আর

আমরা শ্রেষ্ঠ বলেই

এরকম হৃদয়কে তস্য কামলাও ভাবি না। (হৃদয়ের দাম)

হৃদয়হীনতাকে প্রহার করেছেন কবি নানাভাবে। জানিয়েছেন, তারা হৃদয়কে একটি তালিম মনে করে কুচিকুচি করে কেটে ফেলে। রক্তকে রঙ ভেবে শিল্পকর্ম বানাতে চায় তা দিয়ে। তাহলে তাদের খাবার ও শিল্পবোধ কি অন্ধত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। নাকি অন্ধত্বকেই তারা খাচ্ছে এবং তা দিয়েই আঁকছে আল্পনা?

সাত.

এরপর তিনটি অধ্যায়ে অব্যাহতভাবে কল্প-বাস্তবিক অভিব্যক্তি ও শিক্ষার সমাহার ঘটে। এর মধ্যে রয়েছে বাক্যব্যবহারের অনেকগুলো ফর্ম। এসব অধ্যায়ে মুসা আল হাফিজ রচনা করেন (ক) Proverb বা এমন বক্তব্য, যা অল্প কথায় অনেক কিছু বলে দেয়। এসব বাক্যের মধ্যে থাকে একটা Inner Meaning, বাইরে থেকে বাক্যকে পাঠ করে যেটা মনে হয়, অনেক সময় তার ভেতরের অর্থ হয় অন্য কিছু। ফলে এসব বাক্যকে বোঝা ও ব্যবহার করা একান্ত ভাবনাসাপেক্ষ ব্যাপার।

(খ) দুই বা ততোধিক বাস্তব বা কল্পিত চরিত্রের মধ্যে Dialogue বা কথোপকথনের বিনিময় এবং এমন আদান-প্রদান, যাতে দার্শনিক বা নীতিশাস্ত্রীয় অভিজ্ঞান রয়েছে।

(গ) প্রবাদধর্মী বাক্য ও বাক্যাংশ Tractate I Maxim । যা নিরাভরণভাবে সত্য কথাটি জনসম্মুখে প্রকাশ করে। মানবীয় অনুভূতি, উপলব্ধ জ্ঞানের উচ্চসীমায় পৌঁছে একজন চিন্তাবিদ যে সত্য অনুধাবন করেন, যার বিকল্প খুঁজে পাওয়া যায় না, যা থেকে আর মুক্তি ঘটে না, তাকে আমরা বলতে পারি, Tractate ev Adage । কথোপকথন ও আত্মকথনের ছলে এমন

প্রকৃষ্ট বাক্য এসব অধ্যায়ে তৈরি হয়েছে প্রায়ই। হয় বাক্য, নয় সংহত, তীক্ষ্ণ, শাণিত, অন্তর্ভেদী মন্তব্য।

(ঘ) সংক্ষিপ্ত, আকর্ষণীয়, স্মরণীয় এবং কখনও কখনও অবাক করা বা ব্যঙ্গাত্মক বক্তব্য বা Epigram, যা প্রায়ই নিজস্ব জবানিতে এসেছে বা কাল্পনিক সাক্ষাতে অন্য ব্যক্তিত্বের মুখে উচ্চারণ করানো হয়েছে।

(ঙ) সাধারণ বয়ান বা Statement, যা বিশেষ দ্যোতনায় কল্পনার সমাহারে প্রকাশিত। এর মধ্যে সরল বয়ান যেমন আছে, তেমনি কাব্যিক ও চৈন্তিক বৈশিষ্ট্যের সমাহার স্পষ্ট।

(চ) ভাষ্য, ব্যাখ্যা, প্রাসঙ্গিক বিবরণী বা Commentary।

(ছ) বিশেষ লক্ষ্যে, বিশদ বক্তব্য না দিয়ে Illustration বা নমুনা ও নজির উপস্থাপন। ভালো বা মন্দনির্দেশে দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে, প্রকৃতি ও সমাজবাস্তবতা থেকে। নজিরের মধ্যে নিহিত আছে অনেক কথা, যা পাঠককে ভেবে নিতে হয়।

এসব আলোকপাতে অনেক মনীষী ও দার্শনিক, কবি, সাধকদের হাজির করা হয়। যেমন ফুজায়েল ইবনে আয়াজ, সুফিয়ান সাওরি, ইবরাহিম ইবনে আদহাম, আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক, মিয়া তানসেন, আমির খসরু, মির তকি মির, গালিব, ভিক্টর হুগো, টলস্টয়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আল্লামা ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আলবার্ট আইনস্টাইন, লালন সাঁই, ফ্রেডরিখ শিলার, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

এসব অধ্যায়ে ছোট ছোট মন্তব্য বিদ্যুচ্চমকের মতো ভাবনার দুনিয়াকে যেমন ধাক্কা দেয়, তেমনি পুরনো দৃষ্টান্ত, নাতিদীর্ঘ আলোকপাত ও বিশ্লেষণ পাঠকের জন্য বিশেষ স্বাদের বিষয় হয়ে উঠে। এই স্বাদে আলাদা মাত্রা আনে শেষ অধ্যায়; এক পেয়ালা কৈশোর। যেখানে মায়ের মুখে শোনা গল্পে আমরা বুঝতে পারি, মুসা আল হাফিজের মনোগঠনের প্রাথমিক পর্ব। এসব গল্প এতটাই স্পর্শী, যা দৃষ্টিভঙ্গির গঠনে সবার জন্যই দরকার। এ অধ্যায়ে শেষ দুটি রচনায় অনুপম গদ্যে কৈশোরের উপস্থাপন পাঠকের জন্য বাড়তি পাওনা হিসেবে বিবেচিত হবে।

আট.

'জন্ম-মৃত্যুর সিগনেচার' মূলত জীবনবোধের নির্মাণ ও বয়ানের গ্রন্থ। এর বিষয় সর্বাত্মক। জীবন ও জগতের মৌলিক সমস্যা বা প্রশ্নসহ মানুষের

অভিজ্ঞতার সকল দিকই গ্রন্থের শিরোনামের আওতায় আসে। ফলে মুসা আল হাফিজ বিচিত্র বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেছেন এবং করিয়েছেন। কারণ তার মেজাজে রয়েছে দার্শনিক অনুসন্ধান। ডক্টর স্কিয়াড ঠিকই বলেছেন, 'মানব অভিজ্ঞতার এমন কোনো দিক নেই, সমগ্র সত্তা রাজ্যের এমন কোনো কিছু নেই, যা দর্শনের পরিধি বা আওতার বাইরে, কিংবা দার্শনিক অনুসন্ধানী দৃষ্টি যার দিকে প্রসারিত হয় না।'

তবে এ সিরিজের অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় 'জন্ম-মৃত্যুর সিগনেচারে' মুসা আল হাফিজ তুলনামূলকভাবে অধিক আধ্যাত্মিক ও ভাববাদে মুখরিত। মানুষ যেহেতু দৈহিক ও মানসিক সত্তার সমন্বয়ে গঠিত। সে যুগে যুগে মানসিক তৃপ্তি ও শান্তির অন্বেষায় কাজ করে। আধ্যাত্মিক পিপাসা ও প্রয়োজন তারই একটি দিক, যা মানুষের চিরন্তন সমস্যা। পরম সত্তার পরিচয় পাওয়া, অনাবিল প্রেম ও আনন্দ, সত্য ও শান্তি এবং মোক্ষ ও মুক্তি লাভ ইত্যাদির জন্য ভাববাদের আশ্রয় নেয় মানুষ। মুসা আল হাফিজের সত্তায় এর উপস্থিতি প্রগাঢ়। এ গ্রন্থে ভাববাদিতা লেখকের উৎস ও এ যাবত উপসংহারকে একই স্রোতে মিলিয়ে দেয়।

পাঠশেষে বইটি একধরনের পুলক ও জ্ঞানীয় সফরের তৃপ্তিকর আস্বাদ ছড়িয়ে দেয়, সাথে সাথে মনের গহীনে জীবনীশক্তির ধ্যান ও কোলাহল ছড়াতে থাকে।

—ড. মো. রিজাউল ইসলাম
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাবিপ্রবি, সিলেট।

সূচিপত্র

প্রশ্নের শামিয়ানা	২১
শীলিত শিলালিপি	৩১
গল্প কিংবা চৈতন্যদুহিতা	৪১
আগুনের মৌচাক	৫৫
কল্পজৈবনিক স্বগতোক্তি	৭৩
রুহানি শরাব	৯১
কথনের কোলাজ	৯৭
এক পেয়ালা কৈশোর	১১৫

প্রশ্নের
শামিয়ানা

শিক্ষা ও মূর্খতা

জানতে চাইলাম, ছেলেটিকে কেন লেখাপড়া শেখান না?

তিনি বললেন, শিক্ষা ব্যয়বহুল। অনেক টাকাপয়সা খরচ হয়ে যায়।

আমি বললাম, মূর্খতা তো আরও ব্যয়বহুল। জীবনের পুরোটাই খরচ হয়ে যায়।

সীমানা

প্রশ্ন: শব্দ ও চোখের সম্পর্ক (রসায়ন) কেমন?

উত্তর: শব্দ যে জায়গায় গিয়ে আর বলতে পারছে না, চোখ সেখানেও কথা বলতে পারে।

অনৈতিক সঙ্গ

প্রশ্ন: একাকিত্ব দূর করে মনের আনন্দের জন্য অনৈতিক সম্পর্ককে যারা অবলম্বন করে, তারা আসলে কী করে?

উত্তর: তারা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য মনের অজান্তে বিষের পেয়ালা (হেমলক) পান করে।

ফেরাউনি ধারা

প্রশ্ন: উদ্ধতদেরকে কেন উপরে উঠতে দেওয়া হয়?

উত্তর: তারা যেন নিজেদের ফেরাউন ভাবতে শুরু করে।

প্রশ্ন: নিজেদের ফেরাউন ভাবার সুযোগ কেন তাদের করে দেওয়া হয়?

উত্তর: সলিলসমাধির মাধ্যমে পরবর্তী ফেরাউনদের জন্য যেন তাজা সবক হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: এক ফেরাউনের পতনের মাঝে আরেক ফেরাউনের জন্য কী শিক্ষা থাকে?

উত্তর: বেশি বাড়বি না। তোর পতনও ঠিক এভাবেই আসবে।

প্রশ্ন: ফেরাউনরা তবু এভাবে আসতে থাকে কেন?

উত্তর: ফেরাউনগিরিতে তারা এত স্বাদ পেয়ে যায় যে, এর মর্মন্তুদ পরিণতির কথা তারা ভাবতেই পারে না।

ঢাকার আগন্তুক

প্রশ্ন: জনৈক মন্ত্রী বলেছিলেন, দশ বছর পর ঢাকায় এলে লোকজনের মনে হবে, কোথায় এলাম? ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, না দুবাই? এর কী নমুনা আছে?

উত্তর: আছে। এক লোক ঠিক বছর দশেক পর এলেন ঢাকায়। এসে ঢাকার কিছু দৃশ্য দেখে বাড়িতে কল দিয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। বাড়ি থেকে বলা হলো, কী ব্যাপার, কী হয়েছে?

তিনি বললেন, ভুল করে পাইলট আমারে ব্যাংককে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

এরপর ঢাকার আরেক অংশের কিছু দৃশ্য দেখে বুঝতে পারলেন, না, ভুল করে ব্যাংকক নয়, আমাকে সিঙ্গাপুর নামিয়ে দিয়েছে পাইলট। এবং তিনি নিজেকে বোকা ভাবতে লাগলেন।

তার কিছুক্ষণ পর ঢাকার আরেক অংশের কিছু মনোরম দৃশ্য দেখে বুঝতে পারলেন, হায় হায়, আসলে আমাকে ভুল করে দুবাই নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এতদিন পর দেশে ফিরে এসে এত ভুল কেন হচ্ছে, ভাবতে ভাবতে তিনি নিজেকে পাগল ভাবতে শুরু করলেন।

শত্রু ও তুমি

শত্রু বরাবরই কষ্ট দেয়। আপনার প্রশ্ন, কীভাবে শত্রুকে কষ্ট দেওয়া যায়? ইবনুল জাওজি এর জবাবে বলছেন, তুমি যদি তোমার শত্রুকে কষ্ট দিতে চাও, তবে নিজেকে সংশোধন করে নাও।

রক্তক্ষরণ

বুকের ভেতর অজস্র অগণিত দগদগে জখম দেখে বললাম, এত জখম কীভাবে হলো?

তিনি বললেন, জখমগুলো বাইরে থেকে হয়নি। যারা বুকের ভেতর জায়গা পেয়েছিল, তাদের অনেকেই কাজটি করেছে।

জ্ঞান ও প্রশ্নশীলতা

প্রশ্ন করা হলো, ঘর কি বিদ্যালয়ের বিকল্প হতে পারে না?

বললাম, পারে না?

জানতে চাওয়া হলো, কেন পারে না?

এপিজে আবদুল কালাম এগিয়ে এসে বললেন, বিদ্যালয় হলো মুক্ত জিজ্ঞাসার উন্মুক্ত জায়গা। ঘরে কোনো জিজ্ঞাসা থাকে না।

বলা হলো, জিজ্ঞাসা ছাড়া কি শিক্ষিত হওয়া যায় না?

বললাম, জিজ্ঞাসা ছাড়া ততটুকুই শিক্ষিত হওয়া যায়, যতটুকু বুলি মুখস্থ করে শিক্ষিত হয়, কোনো তোতাপাখি।

জ্ঞানজিজ্ঞাসা

১. একজন লোক এলেন। বলা হলো, তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী।

-এর মানে কী?

-গভীর জ্ঞান বলে বোঝানো হয়েছে সূক্ষ্ম বুঝশক্তি, প্রগাঢ় উপলব্ধি ও বিপুল সমঝদারি।

২. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে নিয়ে কথা হচ্ছিল। সবাই বললেন, তিনি শাস্ত্রজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ। এখানে জ্ঞান এসেছে বিদ্যাবত্তা, শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যের অর্থদানে।

অসুস্থ একজন লোককে দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি চেতনা হারিয়েছিলেন। সর্বশেষ অবস্থা কী জানতে চাইলে ডাক্তার বললেন, এখনো জ্ঞান ফেরেনি।

এখানে জ্ঞান বলতে বোঝানো হয়েছে হুঁশ, চেতনা ও সংজ্ঞা।

৩. ছেলেটি খুব দ্রুত গাড়ি চালায়। এক্সিডেন্ট করে আহত হলো। তার চিকিৎসা করা হলো এবং মুরুব্বিরা বললেন, 'সাবধান, গাড়ি চালাতে মাত্রাজ্ঞান বজায় রাখবে।'

এখানে জ্ঞান মানে বিবেচনাবোধ বজায় রাখা, চৌকান্না থাকা ও সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪. দোকানে একজন ম্যানেজার নিয়োগ দেবেন। একজনের প্রস্তাব এলো। বলা হলো, সে আগে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছে ভালো, তার ব্যাবসা-জ্ঞান যথেষ্ট।

এখানে জ্ঞান এসেছে অভিজ্ঞতা অর্থে।

৫. খোদাতত্ত্ব নিয়ে আলোকপাত করছিলাম। একজনকে প্রশ্ন করলাম, এ বিষয়ে আপনি কী বুঝেছেন?

তিনি বললেন, বুঝেছি, এটি এমন একটি বিষয়, যার কিছু দিক জ্ঞানগম্য নয় আমার। বিশ্বাসে মেনে নেওয়ার, যা হচ্ছে গায়েবের বিষয়।

এখানে জ্ঞানগম্য বলতে বোঝানো হয়েছে বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি।

৬. আদালতে আসামিকে খাড়া করা হলো। উকিল বললেন, তার উপর যে অভিযোগ, সেটি তার জ্ঞানকৃত অপরাধ নয়। এখানে জ্ঞানকৃত মানে সচেতন ও সজ্ঞান কাজ।

৭. বেদ পড়ছিলাম। একজন জানতে চাইলেন, কী পড়ছেন, কর্মকাণ্ড না জ্ঞানকাণ্ড?

জানালাম, জ্ঞানকাণ্ড পড়ছি। এখানে জ্ঞানকাণ্ড মানে বিদ্যাবিষয়ক, জ্ঞান বা জানা সংশ্লিষ্ট।

৮. বলা হলো, আমাদের চাই বিজ্ঞান। এর মানে হলো বিশেষ জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান কিংবা প্রায়োগিক জ্ঞান। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার দ্বারা লব্ধ প্রণালিবদ্ধ জ্ঞান। যিনি এ জ্ঞানের অধিকারী, তাকে বলি বিজ্ঞানী, মানে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে কোনো বিষয়ে প্রাপ্ত ব্যাপক ও বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী; পরীক্ষা, প্রয়োগ ও প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞানশীল ব্যক্তি।

৯. আমরা বলি, তোমার জ্ঞানগম্যি হোক মানে বুদ্ধিশুদ্ধি হোক; জ্ঞানতৃষ্ণা বাড়ুক মানে জানার আগ্রহ প্রবল হোক; জ্ঞানচক্ষু খুলুক মানে সূক্ষ্মদৃষ্টি জাগ্রত হোক।

১০. কেউ কেউ অবাঞ্ছিত উপদেশ দেয়; আপনি বলছেন, জ্ঞান দিয়ো না। কারো কারো আনন্দপ্রকাশ ও বোঝাবার ক্ষমতাই নেই; আপনি বলছেন, সে তো রসজ্ঞান বঞ্চিত। কেউ কেউ আপনাকে সন্তানতুল্য বিবেচনা করতেন; আপনি বলছেন, তিনি আমাকে পুত্রজ্ঞান করতেন।

এই যে জ্ঞানের এত অর্থ, এত তাৎপর্য, ব্যবহারের এত মাত্রা ও দিগ্বলয়, তা বুঝিয়ে দিচ্ছে জ্ঞানের সংজ্ঞায়ন সহজ নয়। তার পরিসর ও ক্ষেত্রনির্দেশও অনেক জটিল। কিন্তু আমাদের তো জানতে হবে। অতএব, প্রশ্ন করা হলো, জ্ঞান কী?

অনেক ভেবে লিখলাম, কোনো বিষয় সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা থাকাটা হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞান মূলত যথার্থ পরিচয়ে থাকা। বুদ্ধি, বোধি, উপলব্ধি, অনুসন্ধান, অভিজ্ঞতা, অধ্যয়ন, ব্যষ্টি, সমষ্টি এবং বস্তু ও শাস্ত্রপাঠ এবং প্রজ্ঞা ও স্বজ্ঞার সহায়তায় কোনো বিষয়ে অবগতির মাধ্যমে তার প্রকৃত অবস্থা, তথ্য, বিবরণ বা গুণাগুণ সম্পর্কে যথার্থ পরিচয় ও অভিজ্ঞান; যা হাকিকত বা বাস্তবতার সঠিক সমঝদারি ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে রূপায়িত হয় ।

এটি বহিঃপ্রকাশমূলক হতে পারে, আবার বহিঃপ্রকাশমূলক নাও হতে পারে। যেমন, শিশু মাত্রই আনন্দপ্রিয়, নদীর ধর্ম বহমানতা, তারুণ্যের স্বভাব উদ্দামতা, হিংসার ফলাফল অস্থিরতা; এগুলো বাস্তবতা বা হাকিকত । এ ধরনের হাকিকত ছড়িয়ে আছে দৃশ্যে অদৃশ্যে, বস্তুতে অবস্তুতে, বোধে কর্মে, অতীতে বর্তমানে, কালে কালান্তরে; জীবন ও জগতের সর্বত্র। এ সবের জানাটাই হচ্ছে জ্ঞান।

কিন্তু স্রেফ তথ্যটাই জ্ঞান নয়। তরমুজ একটি ফল, যার স্বাদ মিষ্ট, রং সবুজ এবং যা একটি পুরু আবরণী বেষ্টিত। এসব হচ্ছে স্রেফ তথ্যবিবরণী। কিন্তু তথ্যগুলোকে আপনি কীভাবে কাজে লাগাবেন, সেই বিবেচনা-শক্তির নামই হলো জ্ঞান।

এর মানে, শুরুতে বা সাধারণ অর্থে জ্ঞান হচ্ছে নির্দিষ্ট বিষয় বা ইস্যুতে জড়ো হওয়া তথ্যাবলি, যা বিচার ও বিবেচনাবোধের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পরিচয়ের যথার্থতায় উপনীত হয়।

সুনির্দিষ্ট অর্থে, জ্ঞানকে এমন ব্যক্তির দ্বারা অর্জিত ক্ষমতা, দক্ষতা, মানসিক প্রক্রিয়া এবং তথ্যের সমাহার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, যা তাকে সহায়তা করে বাস্তবতার ব্যাখ্যায়, সমস্যার সমাধানে এবং তার আচরিত পথপ্রদর্শনে।

লোকেরা তথ্য জানাকেই জ্ঞান ভেবে বসে থাকে। একে পরিপাক করার যে বৌদ্ধিক ও বিবেচনাজাত কাজ, তাকে উপেক্ষা করার গাফিলতিকে এভাবে প্রশ্রয় দিয়ে জ্ঞানের সুফল থেকে বঞ্চিত হয়। আর মনে মনে স্বগতোক্তি করে, জ্ঞান তো কম অর্জন করিনি। কিন্তু এত জ্ঞান আমাদের কী কাজে লাগলো বলুন?

বুদ্ধিতত্ত্ব

যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে আলাপ করি প্রায়শ; তাই বুদ্ধিটাকে একটু ঝালিয়ে নেওয়া দরকার।

১.

প্রশ্ন: বুদ্ধি কী?

উত্তর: বুদ্ধি হচ্ছে মানুষ ও প্রাণীর একটি সহজাত অদৃশ্য ক্ষমতা, যেখানে ঘটে চিন্তা ও সমাধানমূলক নানাবিধ শক্তির অপূর্ব সমাবেশ।

এর প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যাকীর্ণ ও সংকটময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ নিশ্চিত হয় এবং জীবনকে এগিয়ে নেওয়ার জরুরি শিক্ষার ধারাবাহিকতাটা বজায় থাকে।

ফলে জীবনের নানা জটিলতা ও পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজনের দক্ষতা তৈরি হয়।

২.

প্রশ্ন: বুদ্ধি কি দক্ষতা?

উত্তর: বুদ্ধি মূলত অদৃশ্য দক্ষতা। দক্ষতা মূলত দৃশ্যমান বুদ্ধি।

৩.

প্রশ্ন: বুদ্ধি কি জরুরি?

উত্তর: বুদ্ধি খুব জরুরি একটি বিষয়; যেহেতু বেঁচে থাকার জন্যে দক্ষতা জরুরি।

৪.

প্রশ্ন: বুদ্ধিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

উত্তর: বুদ্ধি একটি মানসগত ব্যাপার, যাকে অনুভব করা যায় সহজেই; ব্যাখ্যা করতে গেলে ব্যাপারটা জটিল হয়ে যায়। কারণ, বুদ্ধির ব্যাখ্যা করে মানুষ ও প্রাণীর জীবনাচরণ।

৫.

প্রশ্ন: এই ব্যাখ্যার চরিত্র কেমন?

উত্তর: মানুষ ও প্রাণীর আচার-আচরণ যেহেতু বিচিত্র ও বহুমুখী, বুদ্ধির ব্যাখ্যাও তাই বিচিত্র ও বহুমুখী এবং এটিই স্বাভাবিক।

৬.

প্রশ্ন: চালাকি ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যকার সম্পর্কটি কেমন?

উত্তর: লোকেরা ব্যক্তির চালাকিকে বুদ্ধিবৃত্তি মনে করে। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ড ও প্রজ্ঞারহিত স্রেফ চালাকিটা বুদ্ধিবৃত্তির জন্য ক্ষতিকর।

আর সত্যিকার বুদ্ধিবৃত্তি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে জন্ম নেওয়া উদ্ভাবনী শক্তির ফসল।

৭.

প্রশ্ন: বুদ্ধি কীভাবে কাজ শুরু করে?

উত্তর: বুদ্ধি হচ্ছে মানুষ ও প্রাণীর নানা অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার সমাহার, যা তৈরি করে একটি মানসিক শক্তি, যা দিয়ে মানুষ ও প্রাণী চিন্তা করে।

সূক্ষ্ম ও জটিল, মূর্ত ও বিমূর্ত, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বিষয়াদি সেইসব চিন্তার আওতায় থাকে।

৮.

প্রশ্ন: চিন্তার কাজ কী?

উত্তর: চিন্তা কাজ করে সমস্যার সমাধানে; যাতে মানুষ নিজের প্রবৃত্তি ও সীমাবদ্ধতার আওতা থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থেকে লক্ষ্যপূরণের জন্য নিজের দক্ষতাকে প্রয়োগ করতে পারে।

চিন্তা কাজ করে, যাতে মানুষ ও প্রাণী জীবনের নানামুখী প্রতিকূলতা মোকাবেলা করতে পারে; নানাবিধ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নিরূপণ করতে পারে এবং পরিবর্তনশীল বাস্তবতার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে।

এই যে সংকট মোকাবেলা, সম্পর্ক নিরূপণ ও পরিবর্তনকে মানিয়ে চলা, তা সম্পন্নতা পায় বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা, বাস্তব জ্ঞান ও অব্যর্থ কৌশল আয়ত্তকরণের মাধ্যমে।

৯.

প্রশ্ন: বুদ্ধির প্রশ্নে সবার মধ্যে কি সমতা থাকে?

উত্তর: থাকে না। কারণ, বুদ্ধি হলো মনের সেই কেন্দ্রীয় শক্তি, যার পরিচালনায় মনের অন্যান্য শক্তি বিভিন্ন কাজ করে থাকে। ফলে যে কেন্দ্রীয় মানসিক শক্তি কাজকে নিয়ন্ত্রণ

করে, তা সকল কাজে সমানভাবে প্রতিফলিত হয় না। ফলে এক বিষয়ে বুদ্ধির পরিচয় ঘটার মধ্য দিয়ে একজনের তরফে সকল বিষয়ে বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটবে, তেমনটা দাবি করা যায় না।

আর বুদ্ধির উপাদানগুলো এমন, যা মানুষের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হয় না। যেমন সব মাটিতে সকল শস্য ফলে না। ফলে কারো বুদ্ধিবৃত্তির মাত্রা অধিক হয়, কারো হয় কম।

১০.

প্রশ্ন: বুদ্ধির মাত্রা কীভাবে বুঝবো?

উত্তর: বুদ্ধির মাত্রা কাদের কেমন, তা বোঝা কঠিন নয়। যাদের বুদ্ধির মাত্রা বেশি, তাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের গঠন এমন হয়, যার ফলে তারা যে কোনো উদ্দীপকের সামনে এলেই দ্রুততার সঙ্গে সাড়া দিতে পারে।

১১.

প্রশ্ন: দক্ষতা উৎপাদক বুদ্ধি না থাকলে কী ঘটে?

উত্তর: সংকট বাড়ে, জমাট হতে থাকে, সমাধান আসে না। পরিবর্তমান বাস্তবতার চ্যালেঞ্জসমূহ গর্জন করে, সমাধান ও অভিযোজন থাকে না। চিন্তা ও তৎপরতা থাকে নামমাত্র; জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলের বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। মন সংস্থিত থাকে বটে কিন্তু সে হয় ডোবাপুকুরের মতো। মানসিক তথা অভ্যন্তরীণ দক্ষতাসমূহের প্রকাশ ঘটে না; ফলে আচরণও থাকে তথৈবচ।

১২.

প্রশ্ন: শিক্ষা থাকলেই কি বুদ্ধির কাজ হয় না?

উত্তর: না, হয় না। বুদ্ধিবৃত্তির অনুপস্থিতিতে শিক্ষা একটি প্রথা হিসেবে টিকে থাকে মাত্র। জীবন ও জগতের প্রায়োগিক সংকট উত্তরণে সেই শেখন-পরিনমনের ধারাবাহিকতাটি আর বজায় থাকে না, যা উৎপাদনশীলতা এবং মানব-উন্নয়নের প্রাণশক্তির আধার।

১৩.

প্রশ্ন: আসমানি হিদায়েত থাকলেই কি যথেষ্ট নয়?

উত্তর: প্রাণী ও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিও আসমানি হিদায়েতের অংশ। ওহির কিতাব হচ্ছে বাইরের আসমানি হিদায়েত আর ফিতরাত ও সহজাত বুদ্ধিবৃত্তি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ আসমানি হিদায়েত। মানুষের উদ্দেশ্যে প্রথমটি এসেছে দ্বিতীয়টিকে আলোকদানের জন্য, সঠিক দিশা ও যথার্থ পথপ্রদর্শনের জন্য; যাতে নিত্য নতুন জটিলতা ও সমস্যার উত্তরণে মানুষ দ্বিতীয় শক্তিটিকে প্রথমটির আলোক-দিশায় পরিচালনা করতে পারে।

ফলে বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে না লাগালে আসমানি কিতাবের দেশনাও নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে; তখন আপনার মস্তিষ্কের শক্তিকোষও কর্মবৃত্তির দক্ষতাকে আর সচল রাখে না।

অপবাদের ধারাক্রম

বলা হলো, অপবাদের গোটা প্রক্রিয়াটি কেন এত খারাপ ও অপকৃষ্ট?

বললাম, প্রতিটি অপবাদই জন্ম নেয় বিদ্বেষের বিষময় অন্তর থেকে; উচ্চারিত হয় মিথ্যায় মোড়ানো মলিন ও কুৎসিত মুখগহ্বর থেকে।

একে বিশ্বাস করে তারা, যারা ভিত্তিহীন ও শেকড়হীন কথা বলে এবং যাদের মধ্যে প্রকৃত বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের কাণ্ডজ্ঞানটি আর অবশিষ্ট নেই।

একে ছড়িয়ে দেয় এমন লোকসকল, যারা মানবসমাজে সংক্রামক জীবাণু বিস্তারকারী মাছি-মশার ভূমিকা পালন করে।

বলা ও শেখা

প্রশ্ন: যিনি বেশি কথা বলেন, তার থেকে কী শেখা যেতে পারে?

উত্তর: বেশি কথা বলা একটি ফায়দাবর্জিত অভ্যাস; আখেরে এই শিক্ষাটাই নেওয়া যেতে পারে বেশি বলার বদভ্যাস থেকে।

হারাম-হালাল

সিপাহি বিপ্লবের পর কবি মির্জা গালিবকে ব্রিটিশ অফিসার প্রশ্ন করলো, আপনি মুসলিম না অমুসলিম?

গালিব বললেন, আধা মুসলিম, আধা অমুসলিম।

অফিসার বললেন, সেটি কীভাবে?

গালিব জানালেন, শূকরের মাংস খাই না কিন্তু মদ পান করি।

গালিব জানতেন, শূকরের মাংস না খেলেই মুসলমান হওয়া যায় না।

কিন্তু এখনকার অসংখ্য লোক এমন, যাদের কাছে কেবল শূকরের মাংস হারাম আর সবই হালাল।

ঘটনা হলো, নিজেদের তারা গালিবের মতো অর্ধেক নয়, বরং পূর্ণ মুসলমান মনে করেন।

শীলিত
শিলালিপি

ক্রিয়াশীলতা

একশোবার মধুর গল্প শোনার চেয়ে একবার খাঁটি মধু পান করা বেশি ফলদায়ক।

অত্যাচারের রকমফের

আপনার সুরেলা সংগীতও ভীষণ অত্যাচারী হতে পারে, যদি পাশে থাকেন—কোনো মুমূর্ষু রোগী।

ব্যস্ততা ও উর্বরতা

অভিনন্দন ব্যস্তবাগীশ মানুষকে। কিন্তু দুঃখ সেই শশব্যস্ত লোকের জন্য, যার অতিশয় শুগুল বা ব্যস্ততা আছে কিন্তু কোনো পাললিক উর্বরতা নেই।

দেখা ও না দেখা

দৃষ্টিবানের অনুমান অন্ধের নিশ্চয়তার চেয়ে শক্তিশালী।

পরিসর

পাগলের দুনিয়ায় নিজের দুনিয়া ছাড়া সবকিছু পাগলামি।

বিনয়ের চরিত্র

অহংকারের দুনিয়ায় বিনয় যদিও অনিরাপদ একটি গুণ, কিন্তু সে শালীন ও সম্ভ্রান্ত।

রক্ত বনাম হত্যা

খুনির সিস্টেমটি সকল কালে ও সকল শক্তি পরীক্ষা করে এই ফলাফলটি নিশ্চিত করেছে যে, হত্যাকারীরা বড়জোর রক্তে লাল হাতটি ধুয়ে নিতে পারে। হত্যাকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারে না।

দ্বিতীয় জন্ম

মানুষ ভাবে, সেদিন খুব মূল্যবান, যেদিন সে জন্মেছে। আমার কাছে মূল্যবান হলো সেইদিন, যেদিন সে জানবে, কেন জন্মেছে?

গন্তব্য

যে নাবিক জানে না কোন বন্দরে যাবে? নাবিকের পরিচয় ও লাইসেন্স তাকে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে না।

লড়াই ও আত্মশক্তি

আপনি দুর্বল, তাই লড়াই করছেন না, বিষয়টি এমন নয়। আসল কথা হলো, আপনি লড়াই করছেন না, তাই আপনি দুর্বল।

নিষ্ক্রিয়তা

ডুবে যাওয়ার জন্য সাঁতার না দেওয়াটাই যথেষ্ট।

বাঁচা ও মরা

বেঁচে থাকার সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশী হচ্ছে মরে যাওয়া। সত্যিকার বেঁচে থাকা প্রতিবেশীর উপর রাজত্ব করতে সক্ষম।

চিত্র

সাপের ছোবল দিয়ে তৈরি সেতুতে কুমিরের লোভের উপর দিয়ে একা পার হচ্ছে চোখবান্ধা খোঁড়া দিন।

শেখা না-শেখা

যে সকল ভুল থেকে শিখেছি, সেগুলো ভুল থাকেনি, প্রেরণায় পরিণত হয়েছে।

যে সকল ভুল থেকে শিখিনি, সেগুলো ভুলেই আটকে থাকেনি; লজ্জায় পরিণত হয়েছে।

নিয়তি

অশান্ত দীর্ঘশ্বাসগুলো জানে, কত ঐকান্তিকভাবে তারা এক টুকরো প্রশান্ত হাসি হতে চেয়েছিল।

দুঃখ ও দুঃখজয়

দুঃখজয়ের ঠিক আগের অবস্থাটির নাম দুঃখ।

সেখানে পৌঁছে গেছেন। স্বাগত আপনাকে।

বিপ্রতীপ

প্রগাঢ় বিশ্বাস যদি না থাকতো, ভয়াবহ বিশ্বাসঘাতকতা থাকতো না।

অধ্যবসায়

যে লোকটি না থেমেই দুই কিলোমিটার সাঁতরাতে পারে, তারও সাঁতরানো শুরু হয়েছিল দুই মিটারের ডুবসাঁতার থেকে।

অনুপ্রেরণা

তারা বললেন, অনুপ্রেরণা সম্পর্কে কিছু বলুন।

বললাম, অনুপ্রেরণা সম্পর্কে জরুরি কথা হলো, কারো অনুপ্রেরণার জন্য অপেক্ষা করবেন না।

ভাগ্য ও দক্ষতা

আপনার ভাগ্য হলো, সে আপনাকে সুযোগ এনে দেবে। কিন্তু দক্ষতা অর্জন করতে হবে আপনাকেই।

দক্ষতার ভাগ্য হলো, তার উপাদানগুলো আপনার মাঝে নিহিত আছে। কিন্তু সাধনা ছাড়া সে যে অর্জিত হওয়ার নয়।

তুমি ও পরিবেশ

ভাবছো, তুমি এমন কেউ যে পরিবেশের ঘেরে বন্দি। কিন্তু আসলে তুমি এমন কেউ, যার মধ্যে আছে পরিবেশ জন্মদানের অমিত সম্ভাবনা।

স্বপ্ন ও বাস্তব

কবিতা আর কিছু নয়। হৃদয়কে শব্দে রূপান্তর করা। শব্দকে এমন স্থাপত্যে রূপান্তরিত করা, যেখানে মানুষ একই সঙ্গে স্বপ্নে ও বাস্তবে খুঁজে পায় নিজেকে বা নিজেদেরকে।